পাক্ষিক

# আহমদী

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায় : ২৬শ বর্ষ : ১৫শ ১৬শ ও ১৭শ সংখ্যা

২৯শে পৌষ, ১৩৭৯ বাংলা : ১৫ ই জানুয়ারী, ১৯৭৩ ইং : ১৫ই সুল হু, ১৩৫২ হিজরী শামসী :

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত ৬'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ ১৪ শিলিং

# সূচীপত্র

আহ্‌মদী
২৬ বর্ষ

১৫শ, ১৬শ ও ১৭শ সংখ্যা
১৫ই জানুয়ারী: ১৯৭৩ ইং


| বিষয় | পৃষ্ঠা | লেখক |
|---|---|---|
| ॥ কোরআন করীমের অনুবাদ | ॥ ১ ॥ | |
| ॥ হাদিস শরিফের অনুবাদ | ॥ ৩ ॥ | |
| ॥ অমৃতবাণী | ॥ ৪ ॥ | হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)<br>অনুবাদ—মোঃ মোহাম্মদ |
| ॥ জুমার খোৎবা | ॥ ৬ ॥ | হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)<br>অনুবাদ—আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ |
| ॥ পয়গাম | ॥ ১০ ॥ | হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)<br>অনুবাদ—শহীদুর রহমান |
| ॥ সমস্যা ও সমাধান | ॥ ১১ ॥ | শামীম আহমদ<br>অনুবাদ—মোহাম্মদ মতিউর রহমান |
| ॥ ইসলাম : অর্থনৈতিক মুক্তির সরল পথ | ॥ ১৬ ॥ | শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান |
| ॥ বিশ্ব-শান্তি কি সম্ভব? | ॥ ২০ ॥ | মোহাম্মদ খলিলুর রহমান |
| ॥ সংবাদ | ॥ ২৪ ॥ | |

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২৬শ বর্ষ : ১৫শ, ১৬শ ও ১৭শ সংখ্যা :
২৯ শে পৌষ, ১৩৭৯ বাং : ১৫ ই জানুয়ারী, ১৯৭৩ ইং : ১৫ ই সুলহ্, ১৩৫২ হিজরী শামসী :

## ॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

### ॥ সুরা কাহ্‌ফ ॥

৯ রুকু

৬১। এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার যুবক (সংগী) কে বলিয়াছিল, আমি থামিব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তৌরাত ও কুরআনী শরীয়তের দুই সমুদ্রের সংঙ্গমস্থলে পৌছাই, আর না হয় যুগযুগান্ত ধরিয়া চলিতে থাকিব।

৬২। অতঃপর যখন তাহারা দুইজন উভয় সমুদ্রের সঙ্গম স্থলে পৌঁছিল, (সেখানে) তাহারা তাহাদের (হেদায়ত) মাছ ভুলিয়া গেল এবং উহা দ্রুত দৌড়িয়া (কুরআনী শরীয়তের) সমুদ্রে নিজ পথ গ্রহন করিল।

৬৩। অতঃপর যখন তাহারা (সেস্থান অতিক্রম

করিয়া) সম্মুখে অগ্রসর হইল, তখন সে নিজের যুবক (সঙ্গী) কে বলিল আমাদের প্রভাতের খাবার নাস্তা আন ; আমরা আমাদের এই সফরের দরুন ক্লান্তি বোধ করিতেছি।

৬৪। সে বলিল, বলুন তো ( তখন কি উপায়ে হইবে ) যখন আমরা সেই পাথরের উপর (বিশ্রামার্থে) অবস্থান করিয়াছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম আর একমাত্র শয়তানই আমাকে উহা আপনাকে স্মরন করাইতে ভুলাইয়া দিয়াছিল এবং সেই মাছ আশ্চর্যজনক ভাবে সমুদ্রে চলিয়া গেল।

৬৫। সে বলিল উহাই সেই (স্থান) আমরা যাহার অনুসন্ধান করিতেছিলাম, অতঃপর তাহারা ( পিছনে ফেলে আসা) নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরন করিয়া প্রত্যাবর্তণ করিল।

৬৬। তখন তাহারা (তথায়) আমাদের মনোনীত বান্দাদের মধ্য হইতে এমন এক জন বান্দার সাক্ষাৎ পাইল যাহাকে আমরা স্বীয় সান্নিধ্য হইতে রহ্‌মত দান করিয়াছিলাম এবং নিজ সামীপ্য হইতে তাহাকে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলাম।

৬৭। মুসা তাহাকে বলিল, আমি কি (এই শর্ত্তে) আপনার অনুসরন করিতে পারি যেন, আপনাকে যে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, উহা হইতে কিছু হেদায়তের কথা আমাকেও শিক্ষা দেন।

৬৮। সে বলিল, তুমি আমার সঙ্গে আদৌ ধৈর্য ধারন করিয়া চলিতে পারিবে না।

৬৯। এবং যে বিষয়ের জ্ঞানকে তুমি আয়ত্ত কর নাই উহার সম্বন্ধে তুমি কিরূপে ধৈর্য ধারণ করিবে?

৭০। সে বলিল. যদি আল্লাহ্‌ চাহেন, তবে আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল পাইবেন, এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করিব না।

৭১। সেই (বুযুর্গ) বলিল, আচ্ছা, যদি তুমি আমার অনুসরণ কর, তবে কোন বিষয় সম্বন্ধে তুমি আমাকে প্রশ্ন করিবেনা, যেপর্যন্ত না আমি স্বয়ং তোমাকে সে সম্বন্ধে কোন কিছু বলি। ( ক্রমশঃ )

# হাদিস শরীফ

## সব্‌র বা ধৈর্য

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

৫। হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একজন মহিলা কবরের পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে ছিল। এমন সময়ে হযরত রসুল করীম (সাঃ) সেই খান দিয়া যাইতে ছিলেন। স্ত্রীলোকটিকে কাঁদিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন "হে মহিলা! খোদাকে ভয় কর এবং সব্‌র কর"। প্রত্যুত্তরে সে বলিল তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, আমার মত বিপদ তোমাকে স্পর্শ করে নাই।" মহিলাটি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে চিনিতে পারে নাই। কোন এক ব্যক্তি তাহাকে জানাইল যে, তিনি রসুলল্লাহ (সাঃ)। তখন সে তাঁহার গৃহে ছুটিয়া গেল এবং বলিল, "আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই।" রসুল করীম সাঃ) বলিলেন দুঃখ কষ্টের প্রথম অবস্থাতেই সব্‌র করিলে উহার সওয়াব লাভ হয়।" ( বোখারী )

৬। হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, সাবধান কেহ যেন বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া মৃত্যুর কামনা না করে। খুব বেশী বিপদগ্রস্থ বা কষ্ট হইলে এরূপ বলা যায় "হে আল্লাহ্! আমাকে জীবিত রাখ যতক্ষণ পর্যন্ত জীবন আমার জন্য মঙ্গলজনক এবং মৃত্যু দাও যখন মৃত্যু আমার জন্য মঙ্গলজনক।" (বোখারী)

৭। হযরত খাব্বাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে মক্কার জীবনে মুশরেকগণের উৎপীড়ন সীমা ছাড়াইয়া গেল। তখন আমরা হযরত রসুলকরীম (সাঃ)-এর নিকট আমাদের অবস্থা জানাইলাম এবং বলিলাম "হুজুর! খোদাতা'লার নিকট হইতে সাহায্য কামনা করুন এবং দোয়া করুন।" তিনি সেই সময় কাবা গৃহের দেওয়ালের ছায়ায় চাদরের উপর শুইয়া ছিলেন। তিনি আমাদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখিয়া বলিলেন "তোমাদের পূর্ববর্ত্তী উম্মতগণের নেক ব্যক্তিদিগকে শত্রুগণ মাটিতে ফেলিয়া করাত দিয়া মাথা চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত করিত এবং লোহার চিরুণী ( বিশিষ্ট অস্ত্র ) দ্বারা মাংস খসাইয়া ফেলিত কিন্তু তাহারা ইহাসত্ত্বেও সত্য ধর্মকে পরিত্যাগ করিত না। এবং খোদার কসম, এই ইসলাম ধর্মও সমস্ত আরবে ছড়াইয়া পড়িবে এবং সকল বাধা বিঘ্ন অপসারিত হইবে; এমন কি একাই এক উষ্ট্রারোহী সান্‌য়া হইতে হাজারামৌত পর্যন্ত সফর করিবে তথাপি তাহার আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও ভয় হইবে না। কিন্তু তোমরা ধৈর্য্য হারাইয়া ফেল।" ( বোখারী )।

৮। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, সেই ব্যক্তি বাহাদুর নহে যে কুস্তিতে অপরকে পরাজিত করে, বরং প্রকৃত বাহাদুর তো সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে আয়ত্তে রাখে।" (বোখরী)

৯। হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রসুল করীম ( সাঃ ) বলিয়াছেন "আমার পরে এরূপ শাসকবর্গ হইবে যাহারা তোমাদের অধিকারসমূহ তোমাদিগকে দিবে না।" সাহাবারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে রসুলুল্লাহ্, তখন আমরা কি করিব।" তিনি (সাঃ) বলিলেন "তোমাদের শাসকবর্গের যে সব অধিকার তোমাদের উপর বর্ত্তায় তাহা তোমরা পালন করিবে এবং তোমাদের যে সকল অধিকার তাহাদের জিম্মায় বর্ত্তায় যাহা তাহারা পালন করিবে না তাহা তোমরা আল্লাহ্‌তা'লার নিকট কামনা করিবে এবং বিদ্রোহ করিবে না ( রেয়াজুস সালেহীন )

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

# অমৃত বানী

## পরীক্ষা নিশ্চয় আছে, খোদা জালেম নহেন

খোদাতায়ালার চেয়ে বেশী পেয়ার, রহম এবং মুহব্বত কেহ করিতে জানে না। কিন্তু আন্তরিকতা অতীব প্রয়োজনীয় কেহ অন্তরের সহিত তাহার হইয়া গেলে সে অবশ্যই দেখিতে পাইবে নিষ্ঠাবানের প্রতি সাহায্য এবং অভিভাবকত্বের গুন তাঁহার মধ্যে আছে কি না? কিন্তু যে তাহাকে পরীক্ষা করিতে চাহে সে স্বয়ং পরীক্ষত হয়। আঁ হযরত (সাঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি আসিল এবং ইসলাম কবুল করিল। ইহার পর সে অন্ধ হইয়া গেল। সে তখন বলিল, ইসলাম গ্রহণ করার জন্য তাহার উপর এই বিপদ আসিয়াছে। সেইজন্য সে কাফের হইয়া গেল। আঁ হযরত (সাঃ) তাহাকে অনেক বুঝাইলেন। সে মানিল না। অথচ যদি সে মুসলমান থাকিত, তাহা হইলে এ শক্তি খোদার ছিল যে তিনি তাহাকে পুনঃ দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দেন। কিন্তু সে কাফের হইয়া দুনিয়াতেও অন্ধ হইল এবং ধর্মেও অন্ধ হইল। আমার দুশ্চিন্তা যে অনেক লোক খোদাতায়ালাকে পরীক্ষা করে। এমন না হয় যে তাহারা পরীক্ষিত হয়। পয়গম্বর (সাঃ) বলিয়াছেন, যে আমার উপর ঈমান আনে, সে যেন বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকে। কিন্তু এসকল প্রারম্ভে ঘটিয়া থাকে। সবুর করিলে আল্লাহ্ তায়ালা তাহার উপর ফযল করেন। কারণ মোমেনের জন্য দুইটি অবস্থা। প্রথম যখন সে ঈমান আনে, তখন তাহার জন্য মুসিবতের এক দোযখ প্রস্তুত করা হয়। উহার মধ্যে তাহাকে কিছুকাল অবস্থান করিতে হয় এবং তাহার ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরীক্ষা লওয়া হয়। যখন সে দৃঢ়তা দেখায়, তখন তাহার জন্য দ্বিতীয় অবস্থা আনা হয় এবং দোযখকে জান্নাতে বাদলাইয়া দেওয়া হয়। বুখারীর হাদিসে বর্ণিত আছে যে, মোমেন ফল নেকীর দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার এরূপ নৈকট্য লাভ করে যে আল্লাহ্তায়ালা তাহার চক্ষু হইয়া যান যদ্বারা সে দেখে এবং কান হইয়া যান যাদ্বারা সে শুনে এবং হাত হইয়া যান যদ্বারা সে ধরে এবং এবং পা হইয়া যান যদ্বারা সে চলে। আর এক হাদিসে বর্ণিত আছে যে, আমি তাহার জিহবা হইয়া যাই যাদ্বারা সে কথা বলে। এই শ্রেণীর লোকের জন্যে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, যে আমার ওলির সহিত শত্রুতা করে, সে যেন আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। এমনি খোদাতায়ালার গয়রত, যাহা তিনি আপন বান্দার জন্য পোষণ করেন। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, আমার অন্য কিছু সম্বন্ধে এত দুশ্চিন্তা হয় না যতখানি মোমেনকে জানিবার জন্য হইয়া থাকে। এই জন্য সে প্রায় অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং আরোগ্য হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্তায়ালা তাহার প্রান লইতে চাহেন, কিন্তু তাঁহাকে বার বার মহলত দেন, যাহাতে সে আরও কিছু দিন দুনিয়াতে থাকিতে পারে

(মলফুযাত ৭ম খণ্ডঃ ১২৭-২৮ পৃষ্ঠা)

আমি ইহা দুঃখের সহিত বলিতেছি যে আমি

ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে কতক লোকের জীবনের বড় উদ্দেশ্য ইহাই যে, সে স্বপ্নলাভ করিতেছে কি না অথবা ইহাই যে তাহার স্বপ্ন লাভ করা চাই। ইহারই উপর সে সমস্ত গুরুত্ব দেয়। আমার বিবেচনায় ইহা এক ইবতেলা। যাহারা এইরূপ ভ্রান্ত ধারনায় নিপতিত তাহাদের স্মরন রাখা কর্তব্য যে ইহার সহিত নাযাতের কোন সম্বন্ধ নাই। কখনও এ প্রশ্ন করা হইবে না যে তুমি কতগুলি স্বপ্নলাভ করিয়াছিলে? আমি এমন লোকও দেখিয়াছি যে, চুরি করিয়া শাস্তি পাইয়াছে এবং সাজা ভোগ করিয়া আসিয়াছে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে তখন সে বলিয়াছে যে, সে চুরি করিতে গিয়াছিল। স্বপ্নে সে জানিতে পারিয়াছিল যে এই রূপ হইবে। ঘোর পাপীও স্বপ্নলাভ করিতে পারে। এখানে আমাদের এক মেথরানী ছিল, সেও স্বপ্ন দেখিত। সুতরাং তোমরা এবতেলায় পড়িও না। খোদাতায়ালার সহিত তোমার নিজেদের সম্বন্ধকে বাড়াও এবং তাহাকে রাজী কর। নিজের আমলের মধ্যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি কর। মানুষের কর্তব্য ইহা দেখা যে, আমার আমালকে আমি কুরআনের আদেশের ছাঁচে ঢালিয়াছি কি না? যদি ইহা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে হাজার হাজার স্বপ্ন লাভ করিলেও ওসব বেকার এবং বেফায়দা। কুরআন শরীফের হুকুম হইল আল্লার হক সমূহ এবং বান্দার হকসমুহ পুরা পুরা আদায় করা। ইহার সহিত গুণ্ডামি, বিশ্বাসঘাতকতা, দুষ্কৃতি ইত্যাদি না থাকে। সে যেন সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র হইয়া যায়। সুতরাং সর্বপ্রথম এই অবস্থার সৃষ্টি কর। তবেই আপনা আপনি ইহার শুভফল লাভ হইবে।

( মালফুজাত ৯ম খণ্ডঃ ১২৬ পৃঃ )

অনুবাদঃ মোহাম্মদ

# জুমার খোৎবা

## হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস ( আইঃ )

## রাবওয়া, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ইং

তাশাহুদ ও তায়াযুয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন ঃ—

আল্লাহ্‌তায়ালা কোরআনকরীমের শুরুতেই একটি সত্য সুকৃতত্ত্বপূর্ণ অতি মহান দোওয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন সুরা ফাতেহার আকারে। এইভাবে প্রারম্ভেই একটি মহতি দোয়া শিখাইয়া তিনি আমাদিগের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিয়াছেন যে, একজন মুসলমানের জীবন দোয়া এবং এক মাত্র দোয়ার উপরই নির্ভরশীল। ইহার পর সুরা বাকার র প্রথমে কোরআনকরীমকে একটি মহামান্বিত, পূর্ণ এবং সর্বাঙ্গীন কেতাব আকারে আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং এই এলান করিয়াছেন যে, এই মহান গ্রন্থ প্রত্যেক প্রকার সন্দেহ-সংশয় এবং দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত, পবিত্র, পরিশ্রুত। ইহার পর মুসলিম উম্মতকে হুশিয়ার ও সতর্ক করিয়াছেন এই বলিয়া যে, "তোমাদিগকে সর্বক্ষণ তিনটি ফ্রণ্টে, তিনটি ক্ষেত্রে, হুশিয়ারীর সহিত শয়তানের আক্রমনের মোকাবেলা করিতে হইবে এবং ইহার জন্য তোমাদিগের সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত।

একটি ফ্রণ্ট বা ক্ষেত্র, যাহার প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষন করা হইয়াছে, উহা হইল অভ্যন্তর ফ্রণ্ট, তরবিয়ত সংক্রান্ত ফ্রণ্ট। ইহার দুইটি দিক আছে। একতো তরবিয়ত প্রাপ্তকে তরবিয়তের উচ্চতীন মার্গে কায়েম রাখার চেষ্টা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে এই চেষ্টাও করা যে, তাহারা যেন অধিকতর রুহানী উন্নতি করিয়া যাইতে থাকে। তরবিয়তের দ্বিতীয় দিকটি হইল এই যে, যাহারা মুসলিম উম্মতে বয়েত (দীক্ষা -এর মাধ্যমে, অথবা জন্মানুসারে আসিয়া যোগ দেয় তাহাদিগকে ইসলামের রঙ্গে সত্যিকার ভাবে রঙ্গীন করা এবং সাচ্চা মুসলমানে পরিনত করার চেষ্টা করা।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, এই কেতাব হুদাল্লেল মুত্তাকীন। ইহার মধ্যে এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, তাকওয়ার উচ্চ মার্গে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও মানুষের হেদায়তের প্রয়োজন থাকে এবং উক্ত প্রয়োজনকে এই কোরআন পূরণ করিতেছে। মুত্তাকীদের জন্য হেদায়তের উপায়-উপকরন ইহার মধ্যে বিদ্যমান। আল্লাহ্‌তায়ালা এই মজমুন (বিষয় বস্তু) একটি দোয়ার আকারে অন্যত্র এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا

অর্থাৎ (হে-আল্লাহ্!) যদিও হেদায়ত তোমার ফজলে আমরা প্রাপ্ত হই, তবুও এই ভয় ও আশঙ্কা লাগিয়া থাকবে যে, আমাদের হৃদয়ে কোন প্রকারের বক্রতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমরা তোমার সমীপে সকাতর নিবেদন ও দোয়ার দ্বারা ঝুঁকিতেছি এবং এই প্রার্থনা করিতেছি যে, যখন আমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়া যাই, সেরাতে-মুস্তাকীম (সরল পথ) আমরা পাইয়া যাই, আমাদের হৃদয় সরল হইয়া যায়, উহার পর যেন আমাদের হৃদয়ে কোন বক্রতার সৃষ্টি না হয়। হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) ও এই ভীতি ও আশঙ্কা সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি

আকর্ষণ করিয়াছেন। আমি একটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি এখন বন্ধুদের সামনে রাখিতে চাই। তিনি বলিতেছেন ঃ—

এস্থলে আমি একথাও প্রকাশ করিয়া দেওয়া উচিৎ মনে করি যে, যত লোক আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা সমস্ত এখনো এরূপ যোগ্য হয় নাই যে, তাহাদের সম্বন্ধে কোন উত্তম অভিমত প্রকাশ করিতে পারি, বরং কেহ কেহ শুষ্ক শাখার ন্যায় দৃষ্ট হয়। তাহাদিগকে আমার অভিভাবক প্রভু আমা হইতে কাটিয়া জ্বালানি কাষ্ঠে পরিণত করিবেন। কেহ কেহ এমন আছে যে, প্রথমতঃ তাহাদের মধ্যে কঠোর বিরাগভাব দেখা দিয়েছে এবং আন্তরিকতার আবেগ ও শিষ্যোচিত প্রেমের জ্যোতি আর তাহাদের মধ্যে নাই, কেবল বল-আমের ন্যায় প্রবঞ্চনাই বাকী রহিয়াছে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁতের ন্যায় মুখ হইতে উৎপাটিত হইয়া পদতলে নিক্ষিপ্ত হওয়া ছাড়া তাহারা এখন আর কোন কাজের যোগ্য নাই। তাহারা ক্লান্ত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে এবং তুচ্ছ দুনিয়া তাহাদিগকে আপন সর্বগ্রাসী ফাঁদে জড়িত করিয়া লইয়াছে। অতএব আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, তাহারা শীঘ্রই আমা হইতে কর্তিত হইবে। তবে যাহার হস্ত খোদা তা'লার অনুগ্রহকে নূতন ভাবে ধরিয়া লইবে সেই ব্যক্তি রক্ষা পাইবে। এইরূপ লোকও অনেক আছেন, যাঁহাদিগকে খোদাতায়ালা চিরকালের জন্য আমাকে দিয়াছেন, এবং তাঁহারা আমার অস্তিত্ব রূপবৃক্ষের সবুজ শাখা স্বরূপ।

হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) এই কথাগুলিতে এই সত্যটিই প্রকাশ করিয়াছেন যে, হেদায়েত লাভ করার পর এই ধারণার বশবর্ত্তী হওয়া ভুল যে, এখন আর আমাদের জন্য এব্‌তেলা বা পরীক্ষা আসিতে পারে না এবং আমাদের উপর শয়তানের সফল আক্রমণ সম্ভবই নহে। মুত্তাকী হওয়ার পরও মানুষের হেদায়েতের প্রয়োজন আছে। এবং যখন আল্লাহ্‌তায়ালা এই দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا

তখন ইহার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, বক্রতা হইতে বাঁচিতে এবং হেদায়েতের উপর কায়েম থাকিতে যে সকল হেদায়েত এবং শিক্ষার প্রয়োজন তাহা কোরআন করীমের মধ্যে বিদ্যমান আছে। সুতরাং এতদোপলক্ষে যে সকল দোয়া কোরআন করীম শিক্ষা দিয়াছে, এবং যে সমস্ত উপায় ও পন্থা শিক্ষা প্রদান করিয়াছে, ঐ সকল হইতে লাভবান হও এবং দোয়া ও তদবীরের দ্বারা প্রচেষ্টা চালাও, যেন হেদায়েত লাভের পর পুনরায় পদস্খলন না ঘটে; আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির জান্নাতের মধ্যে দাখেল হওয়ার পর এমন যেন আবার না হয় যে, সেই সন্তুষ্টির জান্নাতসমূহ হইতে বহিষ্কৃত হও।

সুতরাং তরবিয়তের একটি ফ্রন্ট (বা ক্ষেত্র) তো এই যে, সমস্ত জামাতের এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, একে অন্যের সহযোগী ও সহায়ক এবং সাহায্যকারী হইয়া একে অন্যকে পদস্খলন হইতে রক্ষা করা এবং এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকা যে, "দেখ, কোন সময়ই যেন অহংকার, অহমিকা ও গর্ব ঔদ্ধত্য তোমাদের না পাইয়া বসে। আজেজী ও বিনয়ের সহিত জীবন যাপন কর। তরবিয়তের এই একটি দিক। আর একটি দিক হইল, নূতন যোগদানকারী বা নতুন বংশধরগণের ফ্রন্ট। যখন কোন একটি কাজ একটি দীর্ঘকালে বিস্তৃত হইয়া থাকে, তখন একটির পর আর একটি বংশধরের সুষ্ঠু তরবিয়ত হইতে থাকা আবশ্যকীয়। মোট কথা, দ্বিতীয় দিকটি হইল আওলাদের (তরুনদের) তরবিয়ত নূতন যোগদানকারীদের তরবিয়ত (ইহার বিস্তারিত বিষয়গুলির দিকে এখন আমি যাইব না)।

মোট কথা, هدى للمتقين ( হুদাল্লে লমুত্তাকীন ) এর মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা সুস্পষ্টভাবে এক তো একথা বলিয়াছেন যে, হেদায়েত পাওয়ার পরও উহার উপর কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তোমাদের এক হেদায়েতের প্রয়োজন এবং উহাও কোরআন করীমের মধ্যে বিদ্যমান। এবং দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্‌তায়ালা ইহার প্রতিও ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, কোরআন করীম হেদায়তের যাবতীয় উপকরণ নিজের মধ্যে রাখে ( কোরআনের অন্যান্য স্থানে এসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে )। এখানে ইঙ্গিত স্বরূপ ইহাও বলা হইয়াছে যে, যাহারা হেদায়েত প্রাপ্ত নহে, তাহারা বয়স্কও হইতে পাতে, কিন্তু এখনও ইসলামের হাকিকত তাহাদের উপর প্রকাশিত হয় নাই, অথবা যাহারা শৈশবকাল হইতে উত্তীর্ণ হইতেছে কিন্তু এখনও ঐ প্রকারের উপলব্ধি শক্তি তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠে নাই। যে অবস্থাই হউক না কেন, নুতন ভাবে ( প্রথম হইত ) হেদায়েত দানের জন্য উপায় ও উরকরণ কোরআন করীমের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এবং কোরআন করীম ইহার উপর অত্যন্ত জোর দিয়াছে যে, তরবিয়তে এই দিকটির প্রতিও লক্ষ রাখ এবং এবিষয়ে যেন কখনও গাফলতি করা না হয়।

দ্বিতীয় ফ্রন্ট (বা ক্ষেত্রে), যেখানে আমাদের চৌকস ও সতর্ক থাকিতে হইবে এবং উহার দিকে সুরা বাকারার শুরুতেই আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। উহা এই যে, "হুদাল্লেল মুত্তাকীন এর মজমুন সম্বন্ধে আয়েত সমূহ বর্ণনা করার পর আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন :

অর্থাৎ আর একটি শ্রেণী বা দল আছে ( এই কামেল গ্রন্থের নুজুলের পর ) যাহাদের মন ও মস্তিষ্ক এবং আত্মার অবস্থা এই যে, তোমরা তাহাদিগকে এনজারী ( ভীতি ও সতর্কতা সূচক ) ঐশী-ভবিষ্যদ্বানী সমূহ শুনাইয়া সতর্ক কর বা নাই কর তাহার জন্য উভয়ই সমান। তাহারা এদিকে লক্ষই করিবে না যে, আল্লাহ্‌তায়ালা একজন মহিমান্বিত নবীকে মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর আকার ও সত্ত্বায় দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার ভাগ্যকে তাঁহার পবিত্র সত্ত্বার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং যে ব্যক্তি তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে না সে এই দুনিয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত থাকে এবং পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মন-মস্তিষ্ক ও ভাব-ধারণার এই অবস্থা থাকিবে যে, তোমাদের সতর্ক করা না করা, তাহাদের জন্য সমান, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা কিরূপে ঈমান আনিতে পারে ? এজন্য তোমাদের উপর এই কর্ত্তব্য ন্যস্ত করা হইতেছে যে, তোমরা তাহাদের ধ্যান-ধারনার এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের চেষ্টা কর। এসম্বন্ধেও আল্লাহ্‌তায়ালা বিস্তারিতভাবে কোরআন করীমে হেদায়েত ও নির্দেশ্য-বলী দান করিয়াছেন। আমাদিগকে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তোমাদের অন্তরে এইরূপ লোকদের জন্য এত প্রবলবেগে দয়ার মনোভাবের যেন উদয় হয় যে, তোমরা যেন সর্বদা তাহাদের জন্য দোয়া করিতে থাক, তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার অসন্তুষ্টি ও রোষ ক্রয় করিতেছে, তাঁহার আওয়াজে সাড়া দিতেছে না, "হে খোদা ! তুমি তোমার এই বান্দা দিগকে এই জাহান্নাম হইতে পরিত্রান দান কর তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত কর, তাহাদের অন্তরের এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত কর।"

এসম্বন্ধে আমি বলিয়া আসিয়াছি যে, কোরআন করীম অত্যন্ত বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করিয়া নির্দেশাবলী দিয়াছে। جادلهم التى هى احسن ( অর্থাৎ-সর্বোত্তম উপায়ে তাহাদের মোকাবেলা কর— অনুবাদক ) এনির্দেশের মধ্যমে উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করা ইত্যাদি শত শত নির্দেশাবলী আমাদিগকে প্রদান

করা হইয়াছে। এই ফ্রন্টেও আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত।

এখন ইসলামে উপর সব চাইতে শক্তিশালী ও প্রচণ্ড আক্রমণ ঈসাইয়াত (খ্রীষ্টধর্ম) করিতেছে। এবং দ্বিতীয় স্তরে নাস্তিকতা অর্থাৎ যাহারা খোদার অস্তিত্বই অস্বীকার করিতেছে। খ্রীষ্টধর্মের এই অহমিকা বা ধারণা জন্মিয়াছে যে, তাহারা বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভেই সমস্ত দুনিয়াতে যাহাকে তাহারা 'ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্ট' বলিয়া থাকে তাহার জন্য জয় করিয়া ফেলিবে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ তায়ালা পাঠাইয়া তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণার মূলোচ্ছেদ করিয়া দিলেন। কিন্তু এখনও বিভ্রান্তি ও ঔদ্ধত্যের ( তাগুতী ) শক্তিগুলি, যাহারা উক্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল সম্পূর্ণ নির্মূল হয় নাই এবং মরিয়া হইয়া, ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া ইসলামের বিরুদ্ধে প্রত্যেক প্রকার বৈধ ও অবৈধ পন্থা অবলম্বনে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। একটি উদাহরণ আমি দিতেছি, কিছু দিন হইল, পশ্চিম আফ্রিকা হইতে এই সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, খ্রীষ্টানদের একটি পত্রিকায় একজন খুব বড় পাদ্রীর এক প্রবন্ধে বলা হইয়াছিল যে, এখন পর্যন্ত যে সব পন্থা তাহারা মানুষকে খ্রীষ্টান বানাইবার জন্য অবলম্বন করিয়া আসিতেছে তাহা বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছে। নূতন পন্থা উদ্ভাবন ও অলম্বনের জন্য তাহাদের বিবেচনা করিতে হইবে। কেননা একটি সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা তাহাদের নিকট ইহা প্রমান করিয়া দিয়াছে যে, এ, সকল পন্থায় তাহারা সফলতার মুখ দেখিতে পারিবে না। এবং সে ( উক্ত প্রবন্ধে ) এই পরামর্শ দিয়েছে যে, খ্রীষ্টধর্মকে পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসীদের ঐতিহ্য আচার অনুষ্ঠান ও স্বভাব অনুযায়ী পরিবর্ত্তন করা হউক। ইহারা পৌত্তলিক, কুসংস্কার আছন্ন মূর্তিপূজক যাদু, ঝাড়, ফুঁকে বিশ্বাসী। তাই, উক্ত প্রকারের ভাব ধারণাও খ্রীষ্টানদের মধ্যে আনায়ন করা উচিত, যাহাতে এখানকার মানুষ খ্রীষ্টান হইয়া যায়। ( ক্রমশঃ )

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

# কাদিয়ান সালানা জলসা উপলক্ষে হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেছ (আইঃ) এর পয়গাম

প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভাইসব,

এই কথা জানিয়া আমি খুবই আনন্দিত হইয়াছি যে, আপনারা আর একবার হজরত মছিহ মাউদ (আঃ) এর পাক বস্তীতে কয়েকদিন আল্লাহ ও তাহার রসুল (রাঃ) এর কথা শুনিতে এবং দোয়া নওয়াফেল এবাদত ও জিকীরে এলাহীতে অতিবাসিত করিতে একত্রিত হইয়াছেন। আল্লাহতালা এই জলসাকে শুধু আপনাদের জন্য নয় বরং এদেশবাসী সকলের জন্য বাবরকত করুন। খোদা সত্বর সেই দিন আনয়ন করুন যখন সারা দেশ শুধুমাত্র এক অদ্বিতীয় খোদার সম্মুখে ঝুঁকে যাবে তাহাদের প্রানে হজরত রসুল করীম (দঃ) এর জন্য মহব্বতের বন্যা সৃষ্টি হবে এবং ইসলামের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠবে (আমীন)।

বিরাট উদ্দেশ্যকে হাসিলের জন্য বিরাট কোরবাণীর প্রয়োজন। আমাদের সম্মুখে এক বিরাট উদ্দেশ্য রহিয়াছে। সারা বিশ্ববাসীর হৃদয়কে নেক এবং পবিত্র পরিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার সম্মুখে ঝুকাইয়া দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য অসংখ্য কোরবানীর প্রয়োজন। শুধু আমলের কোরবাণীই নয়, সময়ের কোরবানী এবং নিজ ইজ্জত ও জজ্‌বাতের কোরবানী এবং নিজেদের আত্মার উশর এক মৃত্যু-আনয়নের কোরবানী পেশ করিতে হইবে। এইজন্য যেখানে আপনারা নিজেদের সময় ও আমল দিয়া খোদার দ্বীনের খেদমত করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিবেন সেখানে সর্ব প্রকারের দুঃখ কষ্টও জিল্লতি এবং ক্ষতি খুশী মনে বরদশত করিবার জন্য সর্বদা তৈরী থাকিবেন। গালি শুনে দোয়া করুন দুঃখ কষ্ট পাইয়া লোকদিগকে আরাম পৌছান এবং খুশীর সহিত এই গুলিকে বরদাশত করুন এবং দোয়া করিতে থাকুন রাব্বানাগ্‌ফেরলানা জুনুবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরেনা ওয়াসাব্বেত আকদামানা ওয়ান্‌সুরনা আলাল কাউমিল কাফেরীন।

হে আমাদের রাব্ব্‌ এইরকম যেন না হয় আমাদের দুর্বলতার কারনে ইসলামের বিজয় দিন পিছনে পড়িয়া যায়। তুমি আমাদিগকে দুর্বলতার বদ আছর থেকে রক্ষাকর। এমনও যেন না হয় যে বিরুদ্ধবাদীদের কার্য্যে উত্তেজিত হইয়া প্রতি উত্তরে কিছু করে বসি; বরং ধৈর্য্য শান্তি এবং আনন্দের সহিত সব কিছু বরদাশত করার তৌফিক দাও। ইহাও যেন না হয় যে মোখালেফদের বদআসারাতের দরুন আমরা লক্ষ্য চ্যুত হইয়া যাই। বিরুদ্ধবাদীদের কুফল সমূহের হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর এবং ঈমানে সাবেত কদম রাখ।

হে আমাদের রাব্ব্‌ তোমার সাহায্য ছাড়া আমাদের প্রচেষ্টায় এই উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করিতে পারে না। বিজয় শুধু তোমার নুসরত এবং সাহায্যেই লাভ হইবে। তুমি আমাদিগকে সাহায্য কর এবং সারা পৃথিবীব্যাপী পরিবর্তন সৃষ্টি কর এবং ইসলামকে সত্বর দুনিয়ায় প্রাধান্য দান কর। এই পথে আমাদিগকে সর্বপ্রকারের কোরবানী পেশ করার তৌফিক প্রদান কর এবং শুধু নিজ ফজল দ্বারা ইহাকে গ্রহন কর।

আল্লাহতালা আপনাদের সকলের সাথী হউন সর্ব প্রকারের কোরবানী করার তৌফিক দান করুন এবং সর্বদা তাঁহার সন্তুষ্টি ও ইচ্ছার উপর পরিচালিত করুন (আমীন।

হযরত মীর্য্যা নাসের আহমদ
খলিফাতুল মসিহ সালেছ (আইঃ)
৭ ডিসেম্বর ১৯৭২ ইং
অনুবাদ ঃ—শহীদুর রহমান

# সাদা জেন্দেগী

মূলঃ শাব্বীর আহমদ

অনুবাদঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

[ হযরত খলিফাতুল মসীহ ছানি মুসলেহ মাউদ (রাজিঃ) আল্লাতায়ালার নির্দেশে ১৯৩৪ সালে একটি ঘোষণা করেন। উহার নাম 'তাহরিক-এ-জদীদ।' দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের প্রচারের উদ্দেশ্যই এই তাহরিকের মর্মকথা। এই মহান তাহরিকের ভিত্তিতে জনাব শাব্বীর আহমদ সাহেব, ওয়াকীলুল মাল তাহরিকে জাদীদ "সাদা জিন্দেগী" নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। আমি সেই মূল্যবান পুস্তিকাটির সচ্ছন্দ তরজমা করার চেষ্টা করিয়াছি। ]

( অনুবাদক )

"তাহরীকে জাদীদের" সর্ব প্রথম এবং সবচেয়ে মূল্যবান দাবী হ'ল সাদা সিদা জীবন যাপন করা। ইহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পূর্বে এই দাবীর গুনাগুন এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ঘোষণা কারীর নিজস্ব কথাকে পেশ করা যায়। যাতে আমরা আমাদের বিবেক ও বুদ্ধির সাথে দাবীর সমন্বয় সাধন করতে পারি। হুজুর (রাঃ) বলেনঃ

"বিভিন্ন অবস্থায় কোরয়ান করীমের আদেশ এই যে "ওয়া আম্মা বিনিয়মাতে রাব্বিকা ফাহাদ্দিছ" অর্থাৎ তোমার প্রতি পালকের নেয়ামত সমূহকে বর্ণনা কর। রসুল করীম (সাঃ)ও বলেছেন যে আল্লাহতায়লার নিকট থেকে কোন পুরস্কার পেলে মানুষের চেহারার উপর একটা প্রভাব পড়া উচিৎ। কিন্তু আজ ইসলামের জন্য কোরবানী করার জমানা এবং এমন জমানা যে আমাদিগকে ইসলামের জন্যে আমাদের সিদ্ধ ইচ্ছা সমূহ যতটুকু পারা যায় ত্যাগ করা উচিৎ। যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা না পারা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের উন্নতি হ'তে পারেন। অতপর যাদের হৃদয়ে ভালবাসা আছে, ইসলামের খেদমত করার ইচ্ছা আছে, তারা যেন তাদের জীবনকে সাদা সিদা করে। এ হেন সাদা সিদা যেন ইসলামের সেবার জন্যে বেশীর চেয়ে বেশী সুযোগ পাওয়া যায় এবং দুনিয়ার মধ্যে প্রকৃত সাম্য কায়েম করা যায়, যা ব্যতিরেকে দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারেনা।"

( খুতবা জুময়া ৮ ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪ সন )

হজরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনাড়ম্বর জীবন যাপনের দাবী করতে গিয়ে একটি অপূর্ব অর্থ গ্রহণ করেছেন যার সত্যতা আজ চতুর্দ্দশ শতাব্দিতেও ব্যপক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেন—

"অনাড়ম্বর জীবন যাপনের ঘোষণা মামুলী ঘোষণা নহে, বরং ভবিষ্যত পৃথিবীর শান্তির ভিত্তি ইহার মধ্যে নিহিত।" ( খুতবা জুময়া ৯ ই অক্টোবর, ১৯৩৬ )

আজ প্রত্যেক সরকারই এটা বুঝতে পেরেছে যে অপব্যয়ই দেশের উন্নতির পথে একটা বিশেষ প্রতিবন্ধক। তারা এটা বুঝানোর জন্য বিভিন্ন পন্থায় প্রচার শুরু করে দিয়েছেন যাতে জনসধারণের মধ্যে সাদা সিদা জীবন যাপন করার বাসনা জন্মে। ফল কথা এই যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের জীবনকে আড়ম্বরহীন না করব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে কোন দেশের উন্নতির সম্ভাবনা খুবই কম। সমস্ত

অপব্যয় এবং যে সমস্ত কাজে জাতীয় সম্পদ লুপ্ত হতে থাকে, উহা থেকে যে জাতি হাত গুটাতে পারে ঐ জাতিই বাহাদুর জাতি। অনুষ্ঠানাদির জন্য অযথা খরচ বন্ধ করা উচিৎ। সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য যতটুকু কোরবানী করা প্রয়োজন তা করা দরকার এই গুরুত্বপূর্ণ কথা জামাতে আহমদীয়ার প্রিয় ইমাম (রাঃ) ৩৮ বৎসর আগেই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন নিজের খরচ কম করে দাও। কেননা ইসলামের জন্যে কোরবানীর জমানা এসে গেছে। তিনি বলেছেন ঃ—

"এই জমানার জন্যে আর্থিক কোরবানীর বিশেষ প্রয়োজন। এইজন্য সমস্ত নর ও নারী নিজ নিজ জীবনকে আড়ম্বর করুক। নিজের খরচ কম করে দিক। কেননা যখনই খোদার তরফ থেকে কোরবানীর ডাক আসবে তখন যেন সে নিজেকে প্রস্তুত পায়। কোরবানীর জন্যে তোমার নিয়তই কেবল কোন কাজে আসতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নিকট রসদ না থাকে। একজন অন্ধ জেহাদের আকাঙ্খা পোষণ করলেও উহাতে শামেল হ'তে পারে না। এক গরীব যাকাত দিবার ইচ্ছা করলেও তা পারে না। তাই রসদ না থাকলে ইচ্ছা প্রবল থাকা সত্ত্বেও আমরা কোরবানী পেশ করতে পারি না। ইহার জন্যে আমাদের প্রত্যেকেরই অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা দরকার, যেন খোদা তায়ালার নিকট থেকে ডাক আসার সাথে সাথে আমরা হাজির হতে পারি। যদি তার সুযোগ নাও আসে তবুও খোদার কাছে বলা যাবে যে, আমরা যা কিছু জমা করেছিলাম, ধর্মের খাতিরেই জমা করেছিলাম; যদিও তার উত্তরাধিকারী আমাদের সন্তান সন্ততিগন, (আল ফজল ১২ ই জুন ১৯৩৫)

উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে ইহাই বুঝা যায় যে অনাড়ম্বর জীবন যাপনের ফলে আমাদের খরচ কম হবে এবং আমাদের নিকট এত সম্পদ থাকবে যা থেকে আমরা বিনা দ্বিধায় ইসলামের সেবায় কোরবানী করতে সক্ষম হব। বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক কোরবানী ভিন্ন ইসলামের তবলীগ হতে পারেনা। ইসলামের সেবায় জীবন উৎসর্গ করা খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু আল্লাহর ফজলে জামাতের মধ্যে এর জন্যে একটা বৃহত্তর অংশ সৃষ্টি, হয়েছে যারা এই মহান কাজে নিজেদের জীবন ওয়াক্‌ফ করছেন। এখন প্রশ্ন হল এত অর্থ কোথায় যা দিয়ে অধিক সংখ্যক মোবাল্লেগ ইসলামের তবলীগের জন্যে বহির্বিশ্বে পাঠান যায়। বিশেষ করে বর্ত্তমান সংকট ময় দিনগুলিতে। প্রিয় মাতৃভুমির এই সঙ্কটময় দিনে আমরা অযথা খরচ বাদ দিয়ে তার সেবা করতে পারি। আহমদীদের উপর তো ২টি কর্ত্তব্য। একটি ইসলামের সেবা এবং দ্বিতীয়টি মাতৃভূমির সেবা। আমরা অনাড়ম্বর জীবন যাপনের মাধ্যমেই তা পালন করতে পারি। হজরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলেছেন ঃ—

"তোমরা বৃহত্তর কোরবানী করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও মেহনত এবং কঠোর পরিশ্রম করার শক্তি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হোক, মুশকিল এবং দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে শেখ। যদি তোমাদের নিকট সম্পদ আসে তবে তোমরা বৃহত্তর কোরবানী করার উপযুক্ততা অর্জন করবে, কেবল অন্তরের কোরবানীতে আর্থিক কোরবানীর ফল লাভ হবেনা অন্তর থেকে কোরবানী হওয়ার সাথে সাথে অর্থের সংকুলান থাকলে তবেই কোরবানী পেশ করা যাবে। (বক্তৃতা সালানা জলসা ২৭ শে ডিসেম্বর ১৯৩৭ সন)

বিধির বিধান ইহাই যে, কোন দেশ অথবা জমাতের অবস্থা সর্বদা একই রকম থাকেনা। যে জমাতের দৃষ্টি কেবল এই দিকেই নিবদ্ধ যে কি ভাবে ইসলামকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করা যায়; ইহার জন্যেও

প্রত্যেক প্রাতে নূতন অসুবিধা এবং প্রত্যেক সন্ধ্যায় নূতন উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি হবে সুতরাং ঐ জামাতকে সর্বদা ঐ সমস্ত অসুবিধার পাহাড় ডিঙ্গানোর জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। যখন ঐ সময় এসে পড়বে তখন যে কোন অসুবিধা, তা যতই কঠিন হোকনা কেন তাঁকে কেউ মাঝপথে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হজরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এই সমস্ত ব্যপার অন্তঃ দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং বলেছেনঃ

"যখন বিপদাবলী আসে তখন খাওয়া পরার চিন্তা আমাদের জমাতকে আটকিয়ে রাখতে পারেনা, বরং ঐ খেয়াল করতে হবে যে যদি প্রিয় মাতৃ-ভূমি ত্যাগ করতে হয় তবে সর্বাগ্রে তাই আমাদের করতে হবে। যদি সময়ের তাগদে খাওয়া এবং পরায় কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয় তাও করতে হবে। খুশী এবং হৃদ্যতার সাথে সমস্ত অসুবিধার মোকাবেলা করতে হবে, যেন প্রানের মধ্যে কোন ভীতি বা কষ্টের অনুভূতি না জন্মে।" (আলফজল ১৫ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ সন)

ইসলাম উসুলীভাবে সাদা সিদা জীবন যাপেনের উপর জোর দিয়েছে, বিস্তারিত বিবরন বের করা আমাদের কাজ, হজরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলেছেনঃ—

'এতে কোন সন্দেহ নেই ইসলামী শরিয়তে সাদা সিদা জীবন যাপন করার সজ্ঞা দেয়া নেই; ইসলামীতিগত ভাবে সাদা সিদা জীবন যাপনের নির্দ্দেশ দিয়েছে, সাদা সিদা জীবন যাপন কা'কে বলে তা'র কোন সজ্ঞা দেয়নি। সুতরাং এইপ্রসঙ্গে বহু তর্কের অবতারনা করা হয় এবং সর্ব্বদাই করা হয়। অমুক কাজ সাদা সিদা জীবন যাপন প্রনালীর অন্তভুক্ত করা হয়েছে, তার সাথে সাদা সিদা জীবন যাপন প্রনালীর সম্পর্ক আছে কি? কোন লোক বা জাতি নিজেদের মধ্যে আপোষে এটা মীমাংসা করে নিক যে অমুক কাজও সাদা সিদা জীবন যাপন প্রণালীর অন্তর্ভূক্ত করা উচিৎ কিন্তু সাদাসিদা জীবন যাপন করা হবে কিনা এইনীতির দিক থেকে কোন বিরোধ সৃষ্টি হতে পারেনা। কেননা ইহা ইসলামের হুকুম এবং ইহার স্বপক্ষে কোরআনের বহু আয়াত এবং আঁ ইজরত (সাঃ) এর বহু অমৃত বানী মওজুদ আছে যা আমাদের চলার পথের পাথেয় এবং হেদায়তনামা। আমাদের জ্ঞান বুদ্ধিও ইহার দিকে আমাদিগকে পরিচালিত করে যদি আমাদিগকে এই দুনিয়াতে ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতা কায়েম করতে হয় যা এ দুনিয়া এবং পর জগতে আদম সন্তানের জন্যে স্বর্গ সুখ দান করতে পারে, তবে এই ব্যপারে আস্তে আস্তে আমাদের উপর আরও অনেক বাধ্য বাধকতার সৃষ্টি করতে হবে। এমন ভাবে যেন ইসলামের ইচ্ছা মোতাবেক সারা দুনিয়াতে সাদা সিদা জীবন যাপনের প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে যায়। (খুতবা জুমুয়া ৪ঠা ফেব্রু-য়ারী, ১৯৩৭ সন)

হজরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) যখন জামাতের সামনে এই ঘোষণা জারী করলেন তখন ইহাকে ফরজ না করলেও একভাবে ইহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়াকে অবশ্য কর্তব্য বলে ধার্য করে দিয়েছেন যেমন তিনি বলেছেনঃ—

"আমি জমাতকে সাদাসিদা জীবন যাপন করার জন্যে বলেছি এবং সাদা সিদা জীবন যাপন করা ফরজ নয় নফল—অর্থাৎ যার ইচ্ছা সে করবে যার ইচ্ছা না হয় সে না করবে। কিন্তু আমি এটা বলে দিতে চাই যে, এটা ভিন্ন জমাতের মধ্যে কোরবানী করার সঠিক প্রেরনা কোন ভাবেই সৃষ্টি হতে পারেনা এবং রুহানিয়তের উচ্চ মর্যাদাও লাভ করা যায় না। যদি তোমরা মনে কর যে ইহা ভিন্ন রুহানিয়তের সোপান লাভ করতে সক্ষম হবে, তবে ইহা নিজের আত্মাকে ধোকা দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

কোন সন্দেহ নেই যে ইহা নফল কোরবানী কিন্তু বহু নফল কোরবানীও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। যেমন রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন "নফলের মাধ্যমেই খোদাতায়লার নৈকট্য লাভ করা যায়।"

আমি একথা বলিনা, যে ব্যক্তি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেনা সে মাহমদী নয়। কিন্তু আমি এ কথা অবশ্যই বলি যে, ঐ লোক "আলা শাফা-হুফরাতেম মিনান্নার, অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় আছে তার ইমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার খুবই আশংকা আছে। [ খুতবা জুমুয়া ২৬শে মে, ১৯৩৬ ]

অন্য আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন :—

"কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। সাধারণ খাদ্য খাও। যে ইহার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তোমারও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। তাকে স্পষ্ট বলে দাও যে, আজ থেকে তোমার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।" ( বক্তৃতা—২৬শে মে, ১৯৩৬ )

আমাদের প্রিয় ইমামের এই কথার পর এব্যাপারে আর কোন তর্কের অবকাশ থাকেনা যে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা উচিৎ কি না। ইহা বাদে না ইসলামের খেদমত করার পূর্ণ হক আদায় হয়, না দেশের প্রয়োজনের সময় তাল সামলানো যায়। ইহার জন্যে আমাদের কি কি বিষয়ের সম্মুখীন হতে হবে এবং কি কি পন্থা অবলম্বন করতে হবে! এই প্রসঙ্গে হজরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। সেগুলো সম্বন্ধে ব্যবস্থা নেয়া দরকার। যেমন খাদ্য-দ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, গহনা, বিয়ে সাদী, সিনেমা চিকিৎসা, ইত্যাদি ৭টি বিষয়, যার ব্যাপারে অনেক সময় অযথা খরচ করা হয়। হুজুর ঐ গুলি সংশোধনের জন্যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব দিয়েছেন। যদি ঐ গুলির উপর পূর্ণ ভাবে আমল করা হয়, তবে অনাড়ম্বর জীবন জাপন করা খুব সহজ সাধ্য হবে। নিম্নে ঐ বিষয় গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

**খাদ্যদ্রব্যে অনাড়ম্বরতা :**—অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে গেলে প্রথমেই যে বিষয়টির প্রতি নজর দেখা দেয়া দরকার সেটা হল খাদ্য-দ্রব্য গ্রহনের ব্যাপারে কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত হওয়া এবং যাতে অপচয় না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা। গরীবের জন্য এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু বড় লোকের খাওয়ার ব্যাপারে অনেক সময় কল্পনাতীত খরচ করে এবং খাদ্যদ্রব্যের অপচয়ও করে যথেষ্ট। সুতরাং এই কথাগুলি শুধু বড়লোকদের উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে যাদের সামান্য দৃষ্টি ভঙ্গি বর্ণনা করতে গিয়ে হজরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা) বলেছেন —

"কুলু ওয়াশ্‌রাবু ওলা তুছরেফু, অর্থাৎ খাও এবং পান কর কিন্তু অপচয় করনা। যখন বুঝা গেল খানা-পিনা মাত্রাতিরিক্ত হচ্ছে অথবা সময় বেশী কোরবানীর প্রতি তাগিদ দিচ্ছে তখন তখনই খরচ কম করে দাও। ( খুতবা জুমুয়া ২২শে নভেম্বর, ১৯৩৪ )

হুজুর এই প্রসঙ্গে আঁ হজরত ( সাঃ ) এর আদর্শ জীবনের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন :—

"রসুল করীম ( সাঃ ) এর জমানা ভয় এবং ভীতির জমানা ছিল। ঐ সময় তিনি সাহাবায়ে কেরাম ( রাঃ ) দিগকে যে আদেশ দিয়েছিলেন আমরাও ঐ শিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারি। তিনি নিজেও আমল করতেন এবং হুকুম দিয়েছিলেন যে এক তরকারীর বেশী যেন না খাওয়া হয় এবং ইহার উপর তিনি এত জোর দিতেন যে, কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম ( রাঃ ) ইহাকে অতিরঞ্জিত

করে নিয়ে ছিলেন। যেমন একবার হজরত ওমর (রাঃ) এর নিকট সিরকা এবং লবন রাখা হয়েছিল তিনি বলেছিলেন ঃ—

"দুইটি কেন রাখা হয়েছে' যখন রসুল করীম (সাঃ) একটি খাবার কথা বলেছেন' তাকে বলা হ'ল যে এখানে দুইটি নয় বরং দুইটি মিলে একটি তরকারী হয়। তথাপি তিনি বললেন যে ইহা দুইটি। যদিও রসুল করীম (সাঃ) এতটা করতে আদেশ করেন নি তথাপি এই উদাহরণ থেকে এই কথাই প্রতিয়মান হয় যে মুসলমানদের জন্যে আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করা বিশেষ প্রয়োজন এবং ইহার জন্যে ঐ রকম তাকিদ ছিল। আমি হজরত ওমর (রাঃ) এর মত দাবী করিনা এবং এই কথাও বলিনা যে লবন এক তরকারী এবং সিরকা আর এক তরকারী।" (খুতবা জুময়া ২৩ শ নফেম্বর, ১৯৩৫ )

খাদ্যদ্রব্যে আড়ম্বরহীনতা এবং কষ্ট সহ্য করার প্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আঁ হজরত (সাঃ) এর সুন্নত পালনার্থে হজরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এক তরকারী খাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন।" যেমন তিনি বলেছেন ঃ—

"যাদের খাওয়া দাওয়ার মধ্যে বাহুল্য পাওয়া যায় তারা জীবন বা মালের কোনও কোরবানীই করতে সক্ষম হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থার পরিবর্ত্তন না হয় খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে অনাড়ম্বরতা সৃষ্টি কর। একের অধিক তরকারী ব্যবহার করনা। প্রত্যেক আহমদী যে এই সংগ্রামে আমার সাথে যোগ দিতে চায় তার প্রতিজ্ঞা করা দরকার যে আজ থেকে সে একের অধিক তরকারী খাবেনা।

(খুতবা জুময়া ৭ই এপ্রিল, ১৯৩৭ সন)

এই হেদায়াতের উপর আমল করলে যেমন খরচ কমে যায়, তেমনি বন্ধু বান্ধবকে সাহায্য করার রসদ সৃষ্টি হয়। ইহার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে হুজুর (রাঃ) বলেছেনঃ—

"সবাইকে এক প্রকার খাবারের আদেশ দেওয়া হয়েছে আমীর গরীবের বিশেষত্ব নেই। যদি বন্ধুগণ ইহার প্রতি পূর্ণ ভাবে আমল করেন, গরীব ভাই আমীর ভাইকে দাওয়াত দিলে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবেনা এবং দাওয়াতে বহু বন্ধু বান্ধবকে আনার সুযোগ হবে। প্রথমে যদি ১০ জনকে দাওয়াত করা যেতে পারে, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করার জন্য ৩০।৪০ জনকে দাওয়াত দেওয়া যাবে। আমীর যদি কোন দাওয়াতের ব্যবস্থা করতে চায় ১০/১৫ জনের খাবার তৈরীর প্রয়োজন হয়। যেহেতু কারও কাছে অকারণে অনেক টাকা পয়সা থাকেনা তাই ১০।১৫ জনের বদলে কষ্টে সৃষ্টে কেবল গুটিকতক আমীর বন্ধুকেই দাওয়াত দেয়া হয়। কিন্তু খাওয়ার মধ্যে এত বরকত সৃষ্টি হতে পারে যে, গরীব বন্ধুদেরও দাওয়াত দেয়া যেতে পারে। গরীব এবং আমীরের খাবারের মধ্যে ঘি, মসলা এবং খুসবুর বিশেষত্ব থাকতে পারে, কিন্তু খাবার একই রকম মনে হবে। ইহা সেই দাবীর ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক দিক যাহা দ্বারা দুই শ্রেণীর তত্ত্বের বীজকেই ধ্বংশ করে দেয়া যায়। এই ধারন যেন না থাকে যে দুইটি আলাদা আলাদা শ্রেণী।' (খুতবা জুময়া ২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৮ সন)

ক্রমশ ঃ—

# 'ওসিয়ত' ঃ অর্থনৈতিক মুক্তির সরল পথ

—শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

মানব সভ্যতার প্রবহমান গতিপথে যে দু'টি ধারা আদিকাল থেকে বয়ে চলেছে তার প্রথমটি ধর্মভিত্তিক দ্বিতীয়টি ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মীয় সভ্যতার বর্তমান বৃত্তটির আবর্তন শুরু হয়েছে আজ থেকে ছ'হাজার বছর আগে। ইতিপূর্বে মানব সভ্যতার আর কতটা অনুরূপ বৃত্তের (Cycle of Civilization) পরিক্রমা শেষ হয়ে গেছে, তার হিসাব আমাদের জানা নেই। তবে, বর্তমান সভ্যতার ধারায় যেকটি ধর্মীয় আন্দোলন বা বিপ্লব মানবমন ও মানবসমাজকে বিপুল ভাবে প্রভাবান্বিত করে আছে তার মধ্যে প্রধানগুলো হচ্ছে হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ এবং ইসলাম। অপর পক্ষে, ধর্মনিরপেক্ষ যে যে আন্দালন বা বিপ্লব এখনো মানব সমাজে ক্রিয়াশীল থাকতে পারছে তার মধ্যে প্রধান প্রধান হচ্ছে আর্য, রোমান, ইরানীয়, ব্যবলনীয় এবং ইয়োরোপীয় বা পাশ্চাত্য।

মানব প্রবৃত্তির বিশেষ বিশেষ অহংকেন্দ্রী একদেশ-দর্শী সভ্যতার ইতিহাসের গবাক্ষ পথে তাকিয়ে থাকলে দেখা যাবে, উল্লিখিত ধর্ম নিরপেক্ষ আন্দোলন গুলোর শেষ পর্যায়ে এসে পৃথিবী আজ নিরংকুশ-ভাবে বস্তুবাদী হয়ে পড়েছে:---অর্থাৎ প্রজনন আশ্রয়ী কুলীনকেন্দ্রী আর্য সভ্যতা; আহ্‌রীমান ও ইয়াজদান-উদ্ভূত নীতি এবং রাজনীতি সর্বস্ব ইরানীয়ান সভ্যতা; আইন ও অধিকার সচেতন রোমান সভ্যতা; আদ-সামুদের রসায়ন, জামিতি ও জ্যোতিষপন্থী ব্যাবীলনীয় সভ্যতার মিছিল পেরিয়ে এসে পৃথিবীটা আজ বস্তু এবং ভুগোলের বৃত্তে দ্রুত বিচরনশীল। এই বস্তুবাদ এবং নিজ নিজ ভুগোলবাদ বাস্তবায়নের অন্তরালে যে দর্শন ক্রিয়াশীল তা মূলতঃ এবং প্রধানতঃ অর্থনীতি সঞ্জাত। তার প্রবাহ দু'টি একটি পুজিবাদ---ক্যাপিট্যালিজম, অপরটি সমাজবাদ কিংবা কম্যুনিজম। দর্শনগতভাবেই এর প্রথমটি ধর্মহারা দ্বিতীয়টি শেষ পর্যায়ে ধর্মবিরোধী।

বিগত শতাব্দীর শুরু থেকে মানুষ পার্থিব উন্নতি বিশেষতঃ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে যত বেশী প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে এর আগের ইতিহাসে তার কোনো নজীর আছে কিনা আমাদের জানা নেই। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই প্রচেষ্টায় বিদগ্ধ মানুষের মন নানাবিধ মত ও পথের দিশা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন এবং এখনও ধরছেন। এক্ষেত্রে এক শ্রেণীর চিন্তাবিদরা অন্যশ্রেণীর চিন্তাবিদদের ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ করছেন এবং নিজেদের মতের প্রাধান্য ও পথের সারল্য প্রদর্শনের প্রতিযোগীতা চালিয়ে যাচ্ছেন। মানবচিন্তার পরিমণ্ডলে এই প্রতিযোগীতা অবান্তর নয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আপাততঃ কে বিজয়ী হলেন এবং কে বিজিত হলেন সেটা যতখানি বড় কথা, তার চেয়েও বড় কথা, কার বা কাদের মতবাদ অন্ততঃ মতবাদের মূলনীতি বা মূল বুনিয়াদটা সর্বকালীন ও সর্বমানবের জন্য কল্যানকর। কেননা, মানব মনের অনুভূতিগুলো বা মানবের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ যদি সর্বকালীন ও সর্বজনীন হয়, তাহলে সেই অনুভূতি ও তার প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে সর্বমানুষের জন্য একটা সর্বকালীন ব্যবস্থাও থাকা বাঞ্ছনীয়। মানবানুভূতির চিরন্তনতার মত সেই ব্যবস্থার অন্ততঃ মূল বুনিয়াদ বা Infra Structure টা চিরন্তন হতে পারলে, চিন্তা রাজ্যের কোলাহলটা অনেকাংশে থেমে যাবে। এজন্যই এ প্রসঙ্গে যে মত ও পথের কথাটা আমাদের মনকে নাড়া দিচ্ছে তাকে আমরা ব্যক্ত করতে চাই। অবশ্য, আমাদের কথা

পেশ করবার আগে আমরা অন্যদের কথারও কিছুটা আলোচনা করবো। বোধ করি এর প্রয়োজনীয়তাও কেউ অস্বীকার করবেন না। আমাদের প্রস্তাবিত মতবাদকে বলা হয় "আল্‌ওসিয়ত" বা The will বা শুধু "ওসিয়ত"। ওসিয়ত একটি সর্বকল্যাণময় গতিশীল অর্থনৈতিক দর্শন; এবং অর্থনৈতিক মুক্তির ও উন্নতির সরল ও সহজ পথ।

## একটি আন্দোলনঃ একটি নতুনবাণী

মানব সমাজে সেই আন্দোলনই সাফল্য অর্জন করে যে আন্দোলন মানুষের জন্যে বয়ে আনে কোনো নতুন বাণী, কোনো নতুন আশার আলো। যে আশার কথা, যে বাণী মানুষ ইতিপূর্বে কোনোদিন শোনেনি, কিংবা শুনে থাকলেও ভুলে গিয়েছিল সম্পূর্ণরূপেই। আমাদের প্রস্তাবিত 'ওসিয়ত' ব্যবস্থা সম্পর্কেও তাই সঙ্গত কারনেই প্রশ্ন উঠবে যে ওসিয়ত এমন কি নতুন বাণী, নতুন আশার আলো বহন করে এনেছে যার জন্য ইহা সমাজের অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে বিপ্লব সংঘটিত করতে সক্ষম হবে? এই প্রশ্নটার জবাব দান করাই আমাদের লক্ষ্য। ওসিয়তের মেধ্যে যে নতুন বাণী, যে নতুন আশার আলোক নিহিত আছে তাকে প্রকাশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের বিশ্বাস সেই আলোকেই দুরীভূত হবে পৃথিবীর অর্থ নৈতিক প্রান্তরের সকল অন্ধকার।

## যুদ্ধ ও শান্তি

আমরা জানি, সামাজিক সংস্কার সাধিত হয় দু'উপায়েঃ এক যুদ্ধে; দুইঃ শান্তিতে। সমাজের দ্রুত এবং আকস্মিক পরিবর্তন সাধিত হয় যুদ্ধের মাধ্যমে, তাছাড়া কোনো নতুন বাণীর শান্তিপুর্ণপথে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও সমাজের পরিবর্তন সংঘটিত করা যায়। দ্বিতীয় উপায়টি সময় সাপেক্ষ বটে, কিন্তু এর প্রভাব ও প্রসার ব্যাপকতর এবং এর ক্রিয়া ও মূল্য স্থায়ীতর হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়ঃ মানুষ এক সময় ধারণা করতো এই পৃথিবীটা চেপ্টা, সে ধারণা করতো--পৃথিবীটা স্থির হয়ে আছে আর সূর্যটা পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরছে। কিন্তু প্রথম যেদিন এই ধারণাগুলোকে ভুল বলে প্রতিপন্ন করা হলো এবং ঘোষণা করা হলো যে,—না, পৃথিবীটা চেপ্টা নয়, গোল; সূর্যটা পৃথিবীর চতুর্দিকে নয়, পৃথিবীটাই সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে,—সেদিন মানব সমাজে মহা কোলাহল পড়ে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষ, অজ্ঞ মানুষ সেদিনের সেই মনীষীদেরকে উপহাস করেছে তাদের বিরুদ্ধে জুলুম সিতম চালিয়েছে; কিন্তু পরিনামে বিজয় মানীষীদেরই হয়েছে। এবং সে বিজয় হয়ে আছে সর্বকালীন ও সর্বজনীন। এজন্য তাঁরা বিদ্রূপ বা কুৎসা রটনাকারী বা নির্যাতনকারীদের সঙ্গে কলহ-কোন্দলে অবতীর্ণ না হয়ে নিজেদের বানীকে নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে প্রচার করে গেছেন। তাঁদের বানীর সত্যতার কারনেই তাঁরা আজ সর্বমানবের শ্রদ্ধেয় এবং সকল সমাজের বরনীয়। আমাদের প্রস্তাবিত ওসিয়তের বানীও এই দ্বিতীয় পথেই ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করবে। এবং এর চিরকল্যানময়তাই অপরাপর অথনৈতিক চিন্তালোকের বিভ্রান্তি থেকে মানুষকে মুক্তি দান করবে।

## ধর্ম মানি কেন?

ওসিয়তের ব্যবস্থা আল্‌-কোরআন সম্মত। কথাটা শুনে অনেকে বলবেন, তবে তো এটা সেই পুরানা কাসুন্দি। সুতরাং অশ্রুবিতব্য। এই 'অনেকের ধারনায় আধুনিক বিশ্ব জ্ঞানে-বিজ্ঞানে রীতিমত আধুনিক। সুতরাং এ যুগে ধর্মের মধ্যযুগীয় রীতি-পদ্ধতি পালনের প্রচেষ্টা মুর্খতা। অতএব পরিত্যাজ্য। এ প্রসঙ্গে আমরা আপাততঃ দুটো কথা পেশ করতে চাই। প্রথমতঃ, পৃথিবীকে আধুনিকীকরনের দাবীটা কোনো কালের কোনো মানুষের একচেটিয়া হতে পারে না। কেননা, সবাই সবার নিজ নিজ যুগে আধুনিক।

তাছাড়া, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে আজকের সভ্যতা অতীতের সকল সভ্যতাকে ছাড়িয়ে এসেছে—একথাটাও ঠিক নয়। কারন, সবাই জানেন, আধুনিক প্রকৌশলীরা আজও ঠিক ঠাহর করতে পারছেন না যে, কোন জ্যামিতিক কায়দায় কি ভাবে পিরামিড তৈরী হয়েছিল; আধুনিক রসায়নবিদরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না যে, কি করে সেদিন অত চমৎকার ভাবে মৃতদেহ রক্ষা করা হতো; আধুনিক বস্ত্র শিল্পীরা এখনও হদীস পাচ্ছেন না যে কোন প্রক্রিয়ায় ঢাকা শহরে অত সুক্ষ্ম-সুন্দর মস্‌লিন উৎপাদন সম্ভব হতো।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম 'অতীতের' বা 'মধ্যযুগীয়' জন্যই পরিত্যক্ত হতে পারে না। কেননা, কালের বা সময়ের গণ্ডীর মাপকাঠিতে কোনো কিছুর বিচার করাটা সুবিবেচনার কথা নয়। সত্যতার মাপকাঠিতেই তার বিচার হওয়া উচিত। "ধর্ম সত্য,—তবে তা অতীতের জন্যই সত্য আজকের জন্য নয়,,—এমন কথা যারা বলেন তাঁদের জন্যে বলছি যে, সত্য চিরকালই সত্য। যা আজ সত্য,—তা যদি এক শ' বছর পরে বা হাজার বছর পরে মিথ্যে হয়ে যায়; তবে তা আসলেই সত্য নয়। তা মিথ্যা। তাকে সত্য বলে ভাবাটাই সত্যমিথ্যা নিরূপনে বাধা হয়ে দাড়িয়ে আছে। ধর্মকে যিনি সত্য মানেন, তাঁকে বরাবরই মানতে হবে যে, ধর্ম সত্য। আর যিনি ধরে রেখেছেন যে, ধর্ম অতীতে সত্য ছিল—আজ নেই, তিনি ধর্মও বুঝেন না—সত্যও জানেন না। তাঁকে আচ্ছন্ন করে বিরাজ করছে সংশয়। আর যিনি ধর্মকে মিথ্যে মেনে নিয়ে পরিহার করতে প্রয়াসী, তিনি লণ্ঠনের ভাঙ্গা চিমনটাকেই সর্বস্ব ভাবেন; তার আলোটাকে দেখতে পান না। পার্থিব গ্লানির ছানিটাকে ভেদ করার মত শক্তি তার দৃষ্টিতে থাকে না।

সকল ধর্মের কেন্দ্রীয় শিক্ষা এক ও অভিন্ন। এবং তা হলো খোদাতায়ালার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সৃষ্টি। যে ধর্ম খোদাতায়ালার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সৃষ্টি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, ধর্ম হিসেবে তাকে মেনে চলার যৌক্তিকতাও ফুরিয়ে যায়। কারন, তখন তার আসলটা শত নকলের আবরনে ঢাকা পড়ে যায়। তাকে নতুন করে আবিষ্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। শ্রীকৃষ্ণ, জরাথুষ্ট্র, বৌদ্ধ, মুসা, ঈসার (তাঁদের সকলের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক) অনুসারী বলে যারা দাবী করে থাকেন, তাঁদের মধ্যে এখন আর এমন কাউকেই দেখতে পাওয়া যায় না যে, যিনি দাবী করতে পারেন এবং প্রমাণ করতে পারেন যে, তাঁর সঙ্গে আল্লাহতায়ালার সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়েছে; তাঁর কাছে খোদা নিদর্শন প্রকাশ করে থাকেন বা খোদার সঙ্গে তাঁর বাক্য বিনিময় হয়ে থাকে। কিন্তু হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের মধ্যে এমন অনেককেই দেখতে পাওয়া গেছে এবং এখনও যায়, যারা খোদাতায়ালার সঙ্গে সম্বন্ধের দাবী করেছেন, তার প্রমানও পেশ করেছেন এবং এখনও করে থাকেন। ইসলামে ধর্মসংস্কারক বা মুজাদ্দিদনের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এই ধারার শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক পুরুষ হযরত ইমাম মাহদী আলাইহেস সালাম। তাঁর পবিত্র ব্যক্তিত্বকে নিষ্কলঙ্ক অবতার, মৈত্রেয় বা মসীহা প্রভৃতি বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই প্রতিশ্রুত মসীহ বা ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের কথা ছিল হিজরী (চান্দ্র) চৌদ্দ শতকের প্রাক্কালে। এবং তার আবির্ভাব ঘটেও গেছে। বস্তুতঃ একটা ধর্মের সত্য হওয়ার এবং জীবন্ত থাকার প্রথম ও প্রধান প্রমাণ হচ্ছে—সেই ধর্মের মানুষের সঙ্গে খোদাতায়ালার সম্বন্ধ সৃষ্টি করার ক্ষমতা। ধর্মগুলোর মধ্যে বর্তমানে শুধু মাত্র ইসলামই এই ক্ষমতার অধিকারী। আর দশটা কারণের সঙ্গে মূলতঃ এ কারণেই আমরা আহ্‌মদীরা ইসলামে

বিশ্বাস করি। অন্য কোনো ধর্মে বা মতবাদে বিশ্বাস করতে পারি না। আমাদের ইসলামে বিশ্বাসী হওয়ার আর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে—মানবীয় জীবন-দর্শন হিসেবে এই ধর্মের সামগ্রিকতা এবং সর্বাঙ্গপূতা।

## বস্তুবাদ

আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক এর যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই দিক থেকে এবং সমরাস্ত্র নির্মাণের দিক থেকে আজকের দুনিয়া অতীতের চেয়ে অনেক-অনেক বেশী উন্নতি সাধন করেছে। আর যে ক্ষেত্রটিতে এ সভ্যতা অগ্রসর হতে পেরেছে বলে দাবী করে, তা হচ্ছে মনস্তত্ব। মানব-মনের বস্তুভিত্তিক এমন কঠিন বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে মানুষ দিতে পারছিল কিনা বলা মুস্কিল। এই সভ্যতার উৎস-ক্ষেত্র ও লালনক্ষেত্র আধুনিক ইয়োরোপের দেশগুলো। এই দেশগুলোই আবার খৃষ্ট ধর্মেরও কেন্দ্রস্থল। তাই, বলা যায়, খৃষ্টধর্মের গর্ভ থেকেই আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার জন্ম হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে যে, একটা ধর্ম থেকে এমন একটা নেতিবাদী দর্শন ও বস্তুকেন্দ্রী জীবনাদর্শের সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি? এর সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে এই যে, খৃষ্ট ধর্মের যাজক-পুরোহিতদের নিকৃষ্ট শ্রেণীর ভণ্ডামী বরদাস্ত করতে না পেরে এবং খোদার একজন পুত্র সন্তান আছে—এই ভয়াবহ মিথ্যাটার প্রচণ্ড আঘাত সইতে না পেরে মানুষের মন সরাসরি খোদাতায়ালার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। তখন কেউবা ঘোষণা করেছে—'খোদা এক?—ঠিক আছে; খোদা তিন?—ঠিক আছে; খোদার পুত্র আছে?—ঠিক আছে; সেই পুত্রের রক্তে সকল মানুষের পাপ মোচন হবে?—ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। তবে, তাকে গির্জার চতুর্দেয়ালের মধ্যেই থাকতে দাও।' আবার কেউবা ঘোষণা করেছে এবং সক্রোধে করেছে যে, খোদা মিথ্যে, প্রেম মিথ্যে, হৃদয় মিথ্যে। বস্তুই সত্য; বস্তু স্বয়ম্ভূ, বস্তুর ধ্বংস নেই। বলা বাহুল্য, প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম প্রসবিত উল্লেখিত বস্তু-বাদী চিন্তাধারার প্রথম ফল ক্যাপিট্যালিজম বা পুঁজিবাদ এবং দ্বিতীয় ফল কম্যুনিজম বা বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ।

( চলবে )

# বিশ্ব-শান্তি কি সম্ভব ?

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

## অশান্তির মূল কারণ সমূহ :—

সকল প্রকার অশান্তি ও বিশৃংখলার মূল কারণ হলো স্বার্থান্ধতা তথা মানসীকতার বিকৃতি এবং আদর্শ-হীনতা। বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের মানসীকতা যদি উদার হতো, এবং আমাদের আদর্শ যদি আন্তরীকতা পূর্ণ হতো তাহলে পৃথিবীতে আজ এত অশান্তি থাকতো না। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান ও শিল্পের অপূর্ব অগ্রগতির ফলে আমাদের জীবন আরো সুখ ও শান্তিময় হতে পারতো। কিন্তু মানুষে-মানুষে যেভাবে দ্বন্দ্ব-কলহ, যুদ্ধ এবং মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে আসছে এবং অদূর ভবিষ্যতে পরিমান, প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতার আরো বহুগুণে বর্ধিত হতে চলেছে তার কি কোন প্রতিকার নেই ? সবাই মানুষ, সকলেই বাঁচতে চায়, আনন্দ পেতে চায়, সকলের দেহে একই রক্ত, মাংস এবং অস্থি বিদ্যমান, সকলের হৃদয়ে প্রেম, প্রীতি ভালবাসার কামনা রয়েছে—সে কথা বারবার আমরা ভুলে যাই কেন ? বর্ণের পার্থক্য, ভাষার পার্থক্য, স্থানের পার্থক্য ধর্ম বা মতবাদের পার্থক্যের জন্য মারামারি করতে হবে, যুদ্ধে এবং মহাযুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে এই জংলী নীতি আজকের সভ্যজগতে কি পরিহার করা যায় না ? আমরা আকাশচুম্বী শিক্ষা, সভ্যতা এবং প্রগতির যে বড়াই করে থাকি, তা কি চরম বিশ্লেষণে অন্তঃসারশূন্য ভাবাবেগ ছাড়া কিছুই নয় ! সমাজ, জাতি এবং আন্তর্জাতিক জীবনে যখন কোন চরম সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয় তখন তো সেই "জোর যার মুল্লুক তার"—এই জংলী নীতিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করা হয় !

আজ সকল সম্ভাবনা, উপায় ও উপকরণ থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে আমরা এক প্রতিশ্রুত শান্তি থেকে বঞ্চিত রয়েছি। বিভিন্ন চিন্তাবিদ দার্শনিক এবং সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অশান্তির কারণগুলো বিভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হতে পারে, কিন্তু একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলে কমপক্ষে নিম্নোক্ত পাঁচটি কার্য কারণের মধ্যে বিশেষ যোগসূত্র ও পারম্পর্য লক্ষ্য করা যেতে পারে।

(ক) **নির্লজ্জতার প্রবাহ :—** ব্যক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে ব্যবহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে পত্র পত্রিকা ও অন্যান্য লেখনীর মাধ্যমে, নাচ, গান ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উদারপন্থী ভাবধারার ( Liberalism-এর ) নামে একটা নতুন প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রবাহের ফলশ্রুতি স্বরূপ একটা নতুন কৃষ্টিবোধের সৃষ্টি হতে চলেছে, যার ধারক এবং বাহক হলো হিপ্পিজ, নুড ক্লাব, কুৎসিৎ নৃত্য-গান সম্বলিত ছায়া-ছবি, কুৎসিৎ পত্র-পত্রিকা ও পর্ণোগ্রাফী, সমুদ্র-স্নান, রৌদ্রস্নান, বিকিনী-মনোকিনী জাতীয় পোষাকের প্রচলন, নেশাজাতীয় দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান চাহিদা, সডোমীর আইনগত স্বীকৃতি, ইত্যাদি। এগুলি নির্লজ্জতার প্রবাহের একটা সামান্য দিক মাত্র—অদূরভবিষ্যতে আরো কত কি যে হতে চলেছে তা না বলাই উত্তম।

(খ) **যুদ্ধ ও যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রতিযোগিতা :-** দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল হিটলারের উগ্র জাতীয়তা-বাদী আন্দোলন তথা নাজীবাদ এবং মুসোলিনীর ফ্যাসীবাদের ফলশ্রুতি স্বরূপ। বর্তমানকালেও বৃহৎ

শক্তিগুলি ( Super Powers ) নিজ নিজ প্রভাব পরিসীমাকে সংরক্ষিত রাখার জন্য এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য পৃথিবীব্যাপী এক বিরাট সামরিক প্রতিযোগিতায় উঠে পড়ে লেগেছে। এই বিরাট রণ-প্রস্তুতি শুধু ভাবী মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই পরিকল্পিত ও পরিচালিত হচ্ছে না, সেই সংগে নতুন নতুন "বিস্ফোরক কেন্দ্রও" সৃষ্টি হচ্ছে—সেগুলোকে অবশ্যম্ভাবী মহাযুদ্ধের পূর্বাভাষও বলা চলে।

## নিষ্ঠুর হৃদয়হীন বস্তুবাদী জীবন ধারার প্রবাহ :—

'যার যত বেশী সম্পদ আছে সে ততবেশী সুখী, বস্তুবাদের এই নীতি অনুসরণ করে আমরা ছুটে চলেছি ধন-দেবতার পিছনে—সে চলার কোন শেষ নেই—চাহিদার কোন সীম-পরিসীমা নেই! মানব জীবনে অর্থের প্রয়োজন আছে, কিন্তু অর্থের জন্যই মানুষের জীবন নয়—এই সাধারণ সত্যটা যেন আমরা বেমালুম ভুলে বসেছি। ফলে আমরা কতকগুলো হৃদয়হীন" অর্থোপার্জনকারী যন্ত্রের ন্যায় রাত্রদিন খেটে চলেছি। দেহ এবং আত্মার সমন্বয়েই মানুষের সৃষ্টি অপরাপর সৃষ্টি হতে ভিন্নতর এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। দেহ রক্ষার জন্য যেমন অর্থের প্রয়োজন আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য তেমনি ঐশী-প্রেম ( হাকুকুল্লাহ ) এবং মানব-প্রেমের ( হাকুকুল এবাদ ) প্রয়োজন রয়েছে। আত্মার দাবীগুলোকে অস্বীকার এবং অবমাননা করার জন্য অশান্তির আগুনে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে কত সুখের নীড়, কত সুখের স্বপ্ন, অকালে ঝরে যাচ্ছে কত অজস্র জীবন—চোখের সামনে শত শত দৃষ্টান্ত দেখেও আমরা সংশোধনের কথা ভাবছি না! আশ্চর্য এই যান্ত্রিক জীবন-ধারা, এই বস্তু-সুখ-সর্বস্ব লোভ লালসা-নন্দিত জীবনের আদর্শ!

অধিকতর সুখলাভের মর্মান্তিক প্রতিযোগীতার ফলে সংঘর্ষ বাঁধছে পদে পদে। সংঘর্ষ বাঁধছে গোত্রে-গোত্র, জাতিতে জাতিতে তথা মানুষে—মানুষে! কোন কোন চিন্তাবিদ এই বিরোধকে "শ্রেণী-সংগ্রাম" বা Class-Struggle বলে অভিহিত করেছেন। ধনী-নির্ধন অথব নোবেল-সার্ফ অথবা পুঁজিপতি-শ্রমিকের মধ্যে এই ধরণের শ্রেণী-সংগ্রামের একটা রূপরেখা আংশিকভাবে অবশ্যই সত্য, কিন্তু পূর্ণ সত্য নয়। কারণ মানব-জীবনে অর্থনৈতিক প্রয়োজনই সকল প্রয়োজনের নিয়ামক নয়—আর্থৎ মানসিক এবং মানবিক-সম্পর্কজনিত প্রয়োজন সমূহেরও এক অবিচ্ছেদ্য গুরুত্ব রয়েছে। শ্রেণী-সংগ্রাম ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের একাধিক কার্য-কারণজনিত ব্যাখ্যার অন্তর্গত অন্যতম ব্যাখ্যা হতে পারে, কিন্তু একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে না। মৌলিক, মানবিক অধিকার, তথা বাঁচার অধিকার, আত্ম-প্রকাশের অধিকার, পরিবার-গঠনের ও আইনসংগত সম্পত্তির অধিকার ধর্মীয় অধিকার চলাফেরার অধিকার বৈষম্যহীন আইনের শাসন ভোগের অধিকার—এই সকল অধিকারের মধ্যেই মানব জীবনের তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। এই সকল অধিকার শুধু অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা বিধানের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই লাভ করা যায় না। সুতরাং মানুষে মানুষে যে বিরোধ তার যথার্থ সমাধান শুধু অর্থনৈতিক সমতার মধ্যেই নিহিত নয়, আবার অর্থকে বাদ দিয়েও নয়। মানবজীবনের অধিকার সমুহের সার্বজনীনতার দিকে লক্ষ্য রেখেই সুষ্ঠু সমাধানের পথ বের করতে হবে।

## (ঘ) আদর্শ-জনিত মতবাদসমূহের মিথ্যা প্রবাহ :

বিশেষ করে ধর্মীয় মতবাদগুলোর বিকৃতির জন্য এবং বাস্তবক্ষেত্রে যথার্থ অনুশীলনের অভাবের জন্য সত্যিকার মতবাদ এবং তার গুরুত্ব যে কতখানি তা কতগুলো মিথ্যা আচার অনুষ্ঠান, কুসংস্কার এবং ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ-প্রণোদিত মতামতের

নীচে চাপা পড়ে রয়েছে। এমনকি প্রায় সকল ধর্মের ঐশী-বিধান-সম্বলিত এবং মানব-কল্যাণমূলক ধর্মগ্রন্থগুলিকেও বিকৃত ও পরিবর্তিত করা হয়েছে। একমাত্র মহাগ্রন্থ কোরআন করীমই অবিকৃত এবং অপরিবর্তিত আকারে বিদ্যমান রয়েছে। পৃথিবীব্যাপী অধর্ম, বিশৃংখলা ও অশান্তির মোকাবেলার জন্য মহা-গ্রন্থ কোরআনের অনুশাসনে বর্তমান যুগের মহা সংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু দুঃখজনক যে, অধিকাংশ মানুষ আজও তাঁকে গ্রহণ করে নাই।

(ঙ) **যোগ্যতম নেতৃত্বের অভাব ঃ** মানব-জীবনের সকল পর্যায়ে আনুগত্য ও শৃংখলাবোধের এত বেশী দৈন্য; পক্ষান্তরে পৃথিবীব্যাপী একটি আদর্শ-গত সংহতি এবং একত্বের এত বেশী প্রয়োজনীয়তা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনই অনুভূত হয় নাই। এই বিশেষ যুগ-সন্ধিক্ষণে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের জাতীয় পর্যায়ে যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা তো আছেই, সেই সংগে বিশেষ করে মহাজাতীয়-পর্যায়ে-এক "আদর্শগত" নেতৃত্বের প্রয়োজন সর্বাধিক। একমাত্র মহাজাতীয় পর্যায়ে আদর্শগত নেতৃত্বের মাধ্যমেই বিশ্ব-শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে; অন্যথায় শুধু জাতিগতভাবে একক বা শ্রেণী-বিশেষের প্রচেষ্টা কিছুতেই কাঙ্খিত শান্তি আনতে পারবে না; বরং তার ফলে নতুন নতুন প্রলয়ংকারী সমস্যারই উদ্ভব হবে! কার্যতঃ এইরূপ আদর্শভীত্তিক মহাজাতীয় নেতৃত্বের অভাবেই সমস্যা সমাধানের মাপকাঠি চরম পর্যায়ে শক্তি পরীক্ষার দ্বারাই নির্নীত হচ্ছে এবং হতে থাকবে!

**২। বিশ্ব-রাজনীতি কিসের দ্বারা দিক নির্ণয় করে ঃ--**

বাস্তবক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন অদর্শবাদ বা ইজমই সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করতে পারছে না। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সকল গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তার সমাধানের কোন কার্যকরী ক্ষমতা কোন সংগঠনেরই নেই। ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও নিষ্ঠুর সত্য যে, কতিপয়-বৃহৎ-শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রই ( Super Powers ) বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে মুরুব্বীয়ানা করছে এবং চরম বিশ্লেষণ ( ultimate analysis ) করলে দেখা যায় যে, অ্যাটম বোমা এবং হাইড্রোজেন বোমার সংখ্যা এবং শ্রেষ্টত্বের দ্বারাই বাহতঃ বিশ্ব রাজনৈতিক গতি প্রকৃতি নির্মীত হচ্ছে অতি সাধারণ কথায় বলতে গেলে সেই অতি পরি-চিত এবং প্রাচীন প্রবাদ "জোর জার মুল্লুক তার" আজও সমভাবে প্রযোজ্য। এবং পূর্বের চাইতে সেই জোর বা শক্তির পরিমান এবং প্রচণ্ডতা অস্বা-ভাবিক ভাবে বর্ধিত হয়েছে এবং পৃথিবীব্যাপী এর প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। অর্থ্যাৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রিকা আসলে দ্বিতীয় শ্রেণীর গুরুত্ব লাভ করেছে আর প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে ঐ পারমানবিক শক্তির শ্রেষ্টত্বের মধ্যে। এই বিশ্লেষণ স্বীকার করতে অনেকে ইতঃস্তত করতে চাইবেন—কিন্তু বাস্তব ঘটনা সমুহ এমন করে সত্যের দ্বারা মোহরাঙ্কিত যে, সংস্কৃতি এবং আদর্শের নামাবলী হাতে নিয়ে কোন না কোন Super Pwer-এর কথাই ভাবতে হয়, আর Super Power ভাবছে Nuclear Supremacy পার মানবিক শ্রেষ্টত্বের কথা। কারণ সবাই জানে যে, ঐ পারমানবিক শ্রেষ্ঠত্ব বা Nuclear Supremacy-ই বিশ্বরাজনীতির আসল দিগদর্শনযন্ত্র!

**৩। বিশ্ব-শান্তির জন্য একটি কার্যকরী রূপরেখা ঃ**

ব্যক্তিগত কল্যানের জন্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কল্যানের জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এবং সর্বোপরি আসন্ন তৃতীয় মহাযুদ্ধের সহাপ্রলয়ং-কারী ক্ষয়-ক্ষতি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য

এমন একটি আদর্শের অনুশীলন করতে হবে যার মধ্যে সকল সমস্যার নিখুঁত সমাধান রয়েছে। মহাগ্রন্থ কোরআন করীমের শিক্ষার আলোকে এইরূপ একটি আদর্শ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। শান্তি, শৃংখলা এবং সার্বজনীন কল্যানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এইরূপ একটি ব্যবস্থার রূপরেখা নিম্নে সংক্ষিপ্তকারে দেওয়া হলো।

১। **প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ঃ**—জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকার থাকতে হবে ( ৪ ঃ ৫৯-৬০ ; ৪২ : ৩৯ )। প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রধান মাপকাঠি হবে নির্বাচন প্রার্থীর যোগ্যতা এবং চারিত্রিক বিশুদ্ধতা। বংশগত বা আর্থিক প্রতিপত্তির ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না।

(২) **রাষ্ট্রশাসক ও কর্মচারীদের দায়িত্ব ঃ** রাষ্ট্রের শাসনভার যাদের উপর বর্তায় তাদেরকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, শাসন করার সুযোগ কোন প্রকার অধিকার ( Right ) নয়, বরং একটা বিশেষ আমানত ( Trust ), এবং তারা সকল ব্যাপারে পক্ষপাতশূন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে কোন প্রকার ভেদাভেদ করবে না ( ৪ ঃ ৫৯ )।

(৩) **সরকারের লক্ষ্য ঃ** যার যতখানি প্রাপ্য তার জন্য ততখানি উন্নতির সুযোগ ও সুবিধার ব্যবস্থা করে দেওয়াই হবে সরকারে মৌলিক উদ্দেশ্য। কোন কারণে কোন ব্যক্তি যদি তার মৌলিক প্রয়োজন অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের নিম্নতম মানবিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম না হয় তবে রাষ্ট্র বাধ্যতামূলকভাবে তার অভাব দূর করবে। ( ২০ ঃ ১১৮-১১৯ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )।

(৪) **অর্থ নৈতিক মূল্যবোধের সংশোধন ঃ** অর্থনীতির মূল বিষয় "অভাববোধ" ( want ) সম্বন্ধে একটা নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি করতে হবে এবং অধুনা প্রচলিত মূল্যবোধগুলোকে সংশোধিত ও পরিমার্জিত করতে হবে। এই মূল্যবোধ এমন হতে হবে যার মধ্যে ধনী, নির্ধন সবাইকে সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন-যাপন করতে হবে। নিরর্থক কাজ, অলসতা, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি বিষয়ে আধিক্য এবং বাহুল্য বর্জন করতে হবে ( ৫ : ৯১, ১৭ ঃ ২৮ )। লোক দেখানো জাঁকজমক, লোকাচার এবং দেশাচারমূলক অনুষ্ঠানগুলোতে অহেতুক খরচ সীমিত করতে হবে ; সিনেমা, ধূমপান, রহস্য পত্র-পত্রিকা, ইত্যাদি বিষয়ে বাহুল্য খরচ কমাতে হবে—সামাজিক আইন প্রণয়ন করে এবং নৈতিক প্রেরণা ও আদর্শবোধের দ্বারা। ব্যক্তিগত ব্যয়ের একটা পরিসীমা থাকা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত গৃহ-নির্মাণ, উদ্যান-রচনা, স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ, ইত্যাদি নিষিদ্ধ করতে হবে। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এবং সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য এসব তৈরী করা যাবে। ( ৫৭ ঃ ২১ )।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশের জনসাধারণ শুধু কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সমস্যারই শিকার হয় নাই, বরং অনেক বেশী পরিমাণে শিকার হয়েছে কতকগুলো কাল্পনিক সমস্যার। তাই দেখা যায় যে, অধিকাংশ লোক রাতারাতি প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে এবং পৃথিবীর কতকগুলো উন্নত দেশ বহু বছরের একনিষ্ঠ পরিশ্রম, সাধনা এবং ত্যাগের মাধ্যমে তিল তিল করে যে ধরণের বৈষয়িক উন্নতি সাধন করেছে এবং তার করেছে এবং তার ফলভোগ করেছে, তার Demonstration Effect-এর প্রভাব পড়েছে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এবং দরিদ্র দেশসমূহের জনগণের উপর। ফলে মৌলিক প্রয়োজনের অভাবজনিত সমস্যা ছাড়াও মনস্তাত্ত্বিক জটিল সমস্যারও উদ্ভব হয়েছে। তাই সকলেরই দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, আজ যে সম্পদশালী সে সাময়িকভাবে হয়তো অধিকতর সুখী। কিন্তু তার দিকে লোভাতুর বা ঈর্ষাকাতর-দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে এবং দুঃখ না করে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতির জন্য আরো বেশী নিয়োজিত করতে হবে সততা, অধ্যাবসায় এবং আন্তরিকতার মাধ্যমে। ( ১৫ : ৮৮ )। রাজনৈতিক গোলযোগ সৃষ্টি করে এবং লুটপাট করে রাতারাতি ভাগ্য পরিবর্তনের মানসিকতাকে বর্জন করতে হবে।

ক্রমশঃ

# সংবাদ

## সাম্প্রতিককালে ভূমিকম্পে বিভিন্ন দেশে কত লোক প্রাণ হারিয়েছে ঃ

### একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা

সম্প্রতি নিকারাগুয়ার রাজধানী ম্যানাগুয়াতে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে ১২ হাজার লোক নিহত হয়েছে। ১৯৩১ সালে একবার ভূমিকম্পের ফলে এই শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তার পাচ বছর পরে শহরে আগুন ধরে মারাত্মক ক্ষতি হয়। এর পর ১৯৬০ সালে একবার ভূমিকম্প হয়। ইরাকে ভূমিকম্পের ফলে গত বার বছরের মধ্যে পঁচিশ হাজার লোক মারা গেছে। ১৯৬৬ সালে ও ১৯৭০ সালে পর পর দুবার ভূমিকম্পের ফলে তুর্কীতে প্রায় ২ হাজার লোক মারা যায়।

বিগত শতাব্দীর সবচেয়ে মারাত্মক ভূমিকম্প হয় চীনের খানসুতে। এই ভূমিকম্পে এক লক্ষ আশি হাজার লোক মারা যায়। ১৯২৩ সালে টোকিওতে মারা যায় ১ লক্ষ চল্লিশ হাজার। ১৯০৮ সালে সেসেলিতে মারা যায় পঁচাত্তর হাজার। ১৯৩২ সালে চীনের উপকুলে মারা যায় ৩২ হাজার ১৯৩২ সালে পাকিস্তানের কোয়েটাতে মারা যায় ৬০ হাজার। ১৯৩৯ সালে তুর্কীতে মারা যায় ৩ হাজার। ১৯০৬ সালে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে শহরের প্রচুর ক্ষতি হয়।

১৯৬০ সালে মরক্কোতে ১২ হাজার লোক মারা যায়। ঐ বছরই চিলিতে এক ভূমিকম্পের ফলে ৫ হাজার লোক মারা যায়। এছাড়া ১৯৭২ সালে ইরাণে ভূমিকম্পের ফলে ১১ হাজার লোক মারা যায়।

## কাদিয়ানের সালানা জলসা

এই বৎসর ৮১তম সালানা জলসায় জনাব মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব, আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, মৌলভী আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব মুরব্বী, জনাব শাহীদুর রহমান সাহেব, জনাব এ. টি, এম. হক সাহেব, জনাব ফজলুল করিম মোল্লা, তাঁহার ছেলে জনাব আমিনুল করিম, জনাব আঃ গনি আহমদ ঢাকা জমাত হইতে এবং নারায়ণগঞ্জ জমাত হইতে জনাব আবদুল করিম সাহেব যোগদান করেন। বন্ধুগণ তাঁহাদের নিরাপদে আসা যাওয়া এবং ফায়দা হাসিলের জন্য খাসভাবে দোয়া করিবেন।

# ব্রাহ্মনবাড়ীয়া তবলীগী ও তরবিয়তী জলসা

ব্রাহ্মনবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে বিগত ১২ইং নভেম্বর বেলা ৪ ঘটিকায় মসজিদুল মাহ্‌দীতে ঈদ পূর্ণ মিলন উপলক্ষে একটি জলসার আয়োজন করা হয়। এতে ঈদের তাৎপর্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে জনাব আলহাজ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব এক জ্ঞান গর্ভ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে আমাদের প্রকৃত ঈদ সেই দিন অনুষ্ঠিত হবে যে দিন সারা বিশ্বে প্রকৃত ইসলাম জয়যুক্ত হবে। সভা শেষে আহ্‌মদীয়া আন্তঃ মহাবিদ্যালয় ছাত্র-সংস্থার পক্ষ থেকে এক চা-চক্রের আয়োজন করা হয়। ঐ দিন বাদ মাগরিব মসজিদে মোবারকে স্থানীয় জামাতের আমাউল্লার আয়োজিত এক সম্বর্ধনাও জনাব চৌধুরী সাহেব ভাষন প্রদান করেন। তিনি আহ্‌মদী মহিলা-দেরকে বিশ্বের নারী সমাজের জন্য আদর্শ স্থাপন করার আহ্বান জানান।

পরদিন বেলা ৪ ঘটিকায় স্থানীয় কমিউনিটি হলে এক সাধারণ জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এডভোকেট জনাব গোলাম ছামদানী খাদেম সাহেব। মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহ্‌মদ সাহেবের ভাষনের পর জনাব আলহাজ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব একমাত্র ইসলামের মাধ্যমেই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে এক অকর্ষনীয় বক্তৃতা করেন।

# আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর, তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পুণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুন :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| * The Holy Quran with English Translation | | T. | 125·00 |
| * The Introduction & Comentary of the Holy Quran | ( 5. vol. ) | | |
| * The Philosophy of the Teachings of Islam | Hazrat Ahmed (P.) | T. | 2.00 |
| * Jesus in India | " | T. | 2.50 |
| * Ahmadiat—The True Islam | Hazrat Mosleh Maood (R) | T. | 8.00 |
| * Invitation to Ahmadiyat | " | T. | 8.00 |
| * The Life of Muhammad (P. B.) | " | T. | 8.00 |
| * The New World Order | " | T. | 3.00 |
| * The Economic Structure of Islamic Society | " | T. | 2.50 |
| * Islam and Communism | Hazrat Mirza Basnir Ahmed (R) | T. | 0.62 |
| * Attitude of Islam Towards Communism | Moulana A.R. Dard (R) | T. | 1.00 |
| * The Preaching of Islam | Mirza Mubarak Ahmed | T. | 0.50 |
| * বিশ্বতিয়ে নূহ | হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ | টা. | ১.২৫ |
| * ধর্মের নামে রক্তপাত | মীর্যা তাহের আহ্‌মদ | টা. | ২.00 |
| * আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব | মৌলবী মোহাম্মদ | টা. | ১.00 |
| * ইসলামেই নবুয়াত | " | টা. | 0.৫0 |
| * ওফাতে ঈসা | " | টা. | 0.৫0 |

ইহা ছাড়া :—

* বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেওয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র।

প্রাপ্তিস্থান :
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকশিবাজার রোড, ঢাকা-১।

Published & Printed by Md. F.K. Mollah at Rabin Printing & Packages
For the Proprietors, Bangladesh Anjuman-e Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacc—1.
Phone No. 283635
*Editor : A.H. Muhammad Ali Anwar.*